ডাকসু নির্বাচন নিয়ে দুটো কথা

অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

| ঢাকা , বৃহস্পতিবার, ১৭ জানুয়ারী ২০১৯

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ বা ডাকসু নির্বাচন আসন্ন। হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক খুব সম্ভব এ নির্বাচন আগামী মার্চ মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শেষ হয়েছে বলে জানা গেছে। যদিও এমফিল অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা, সে বিষয়ে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে। একটি ছাত্র সংগঠন এমফিল শিক্ষার্থীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়েছে। এ দাবি গৃহীত হলে এসব শিক্ষার্থী বিভিন্ন হল ইউনিয়ন ও ডাকসু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। প্রশ্ন উঠবে এমফিলের শিক্ষার্থীকে যদি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে পিএইচডি গবেষকদের দোষটা কোথায়? তারাও যেন ভোটার হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন সে দাবি ওই একই ছাত্র সংগঠন থেকে উচ্চারিত

হওয়া উচিত ছিল। তবে আমার ব্যক্তিগত দুটো ধারণা এখানে উল্লেখ করছি।

আমার ধারণা, এমফিল ও পিএইচডির গবেষকদের এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় না আনাই ভালো। অনেক দিন আগ থেকে আমরা জেনেছি ছাত্রনং, অধ্যয়নং তপঃ। এই প্রবাদতুল্য উক্তি এখন কোথাও বাস্তবতার ধোপে টিকছে না। আমি মনে করি, এমফিল ও পিএইচডির ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে একথা এখন প্রযোজ্য হওয়া উচিত। কেউ হয়তো বলবেন যে, এত বছর পর যখন নির্বাচন হচ্ছে তখন বর্তমানসহ পরবর্তী কয়েকটি নির্বাচনে এমফিল ও পিএইচডি ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ দেয়া প্রয়োজন। এটা যেমন একটি প্রসঙ্গ, ডাকসু নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরও একটি প্রসঙ্গ তোলা যায়।

আমাদের কালে ডাকসু নির্বাচন হতো পরোক্ষ পদ্ধতিতে। ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পরোক্ষ ব্যবস্থায় ডাকসুর কোন পদ কোন হলকে দেয়া হবে তা নির্বাচনের পূর্বেই নির্ধারিত হতো। কোন একটি হলকে একের বেশি পদ দেয়া হতো না। এই প্রক্রিয়ায় ডাকসুর ভিপি যদি হতো ফজলুল হক হল থেকে, তাহলে জিএস হতো রোকেয়া হল থেকে; পরবর্তী বছরে তা বদলে যেত। হয়তো পরের বছর ভিপি হচ্ছে ঢাকা হল থেকে আর জিএস হচ্ছে শামসুন্নাহার হল থেকে। অন্য পদগুলোরও অনুরূপ বিন্যাস হতো।

ডাকসু নির্বাচন ছিল দুই স্তরের। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল ইউনিয়নের নির্বাচন একই সঙ্গে

হতো। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রতি হল থেকে দু'জন প্রতিনিধি ঐ হলের ভোটাররা নির্বাচিত করতো। এমনিভাবে ডাকসুর প্রতিনিধি সংখ্যা হতো ১৬ জন। এই ১৬ জন মিলে সব পদে প্রার্থী নির্বাচন করত। এই পদ্ধতি ১৯৬৮-৬৯ সেশন পর্যন্ত বলবত ছিল। সে বছর ইকবাল হলের (বর্তমান জহুরুল হক হল) জন্যে ভিপি নির্ধারিত ছিল আর জিএস নির্ধারিত ছিল জিন্নাহ হল (বর্তমান সূর্য সেন) হল থেকে। ইকবাল হল থেকে ডাকসু প্রতিনিধি ছিলেন জনাব তোফায়েল আহমদ ও জনাব মাহবুবুল হুদা ভূঁইয়া। সূর্য সেন হলের নির্বাচনটা এনএসএফ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করল, যাতে এনএসএফ প্রার্থীরাই নির্বাচিত হলো। সে কাজটা করা হয়েছিল ইকবাল সোবহান চৌধুরী ও মাহবুবকে কক্ষে তালা মেরে আটকিয়ে রেখে এবং আমাকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে। যার ফলে ভিতর থেকে ইকবাল-মাহবুব আর বাইরে থেকে আমি বা আমরা ভোট জালিয়াতি রোধ করতে পারিনি। এই অভিজ্ঞতার কারণে হোক কিংবা বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আবহের কারণে হোক, পরবর্তী ডাকসু নির্বাচন প্রত্যক্ষভাবে হয়েছিল যেখানে প্রার্থিতা ও ভোটদানের ব্যাপারে কোন বাধা-নিষেধ বা বাধ্যবাধকতা ছিল না। সে ব্যবস্থার প্রথমবারের নির্বাচনে আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন যথাক্রমে ডাকসুর ভিপি ও জিএস নির্বাচিত হয়েছিলেন।

পরোক্ষ নির্বাচনের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমি দীর্ঘদিন পর নির্বাচন হচ্ছে বলে অন্তত ডাকসুতে

পরোক্ষও হলগুলোতে সরাসার নির্বাচনের প্রস্তাব রাখব। হলভিত্তিক পদ বিন্যাস সম্পূর্ণ তুলে দেয়া যায় এবং একই সঙ্গে পদ সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধিটা মাথায় রেখে প্রতিটি হল থেকে ২ জন ডাকসু প্রতিনিধির বদলে ৪ জন প্রতিনিধি রাখা যায়। বর্তমানের হল সংখ্যা বিবেচনায় রাখলে ডাকসুর ভোটার সংখ্যা হবে ৭৬ জন। তারা ভোটাভুটি করে ডাকসুর ভিপি ও জিএসসহ বিভিন্ন পদগুলো পূরণ করবে। হলভিত্তিক পদ বিভাজন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বর্জন করা বাঞ্ছনীয়।

একটি ছাত্র সংগঠন নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে। এর মাঝে সহঅবস্থান ও নিরাপত্তার প্রসঙ্গ এসেছে। এই পরিবেশ সৃষ্টি ও রক্ষায় পরিবেশ পরিষদ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। ১৯৮৮ সালের ডাকসু নির্বাচনের সময় আমি বিশ^বিদ্যালয়ের প্রক্টর ছিলাম। পরিবেশ পরিষদের ধারণাটা আমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত। সেই পরিষদে ছাত্র শিবির ছাড়া সকল ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব ছিল। শিক্ষক প্রতিনিধিত্বও ছিল। যতদূর মনে পরে পরিবেশ পরিষদে সিনেট, সিন্ডিকেট, শিক্ষক সমিতি ও প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিনিধি ছিল। এই পরিবেশ পরিষদ সুন্দর ও সুষ্ঠু নির্বাচনে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল। তদুপরি বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কয়েকজন ছাত্রকে আজীবন এবং কয়েকজন ছাত্রকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এই বহিষ্কারের

ধকল সামলানো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধ্যের বাইরে ছিল। সে সময় শিক্ষামন্ত্রী ছিল শেখ শহিদুল ইসলাম আর সরকারে ছিলেন হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ। তারা বহিষ্কারের ধকল সামলাতে সাহায্য করেছিল বলে পরবর্তীতে নির্বাচন পরিচালনাটি সহজ হয়েছিল।

সে বছর প্রথমবারের মতো ডাকসুতে একটি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। সে পদটির নাম দেয়া হয় পরিবহন সম্পাদক আর তার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ওয়াহিদুজ্জামান চান। নির্বাচনে ভিপি হয়েছিলেন সুলতান মোহম্মদ মনসুর আর জিএস হয়েছিলেন ডা. মোস্তাক হোসেন। নির্বাচনের খাতিরে মেডিকেল ডাক্তার মোস্তাককে নিউট্রিশন বিভাগে ভর্তি করা হয়েছিল। সে ছিল জাসদ ছাত্রলীগের। অন্যান্য দলের এক বা একাধিক অছাত্রকে ছাত্র বানানো হয়েছিল। এমনকি শোনা যায় যে তারেক রহমানকেও ছাত্র হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ভর্তির সুপারিশ করা হয়েছিল যদিও তিনি ভর্তি হননি। ছোট বড় সব দলকে ছাত্রত্ব উপহার দিতে গিয়ে বিভাগ পাওয়া যাচ্ছিল না। ছাত্র নেতারা পরামর্শ দিল যে সবাইকে আলমিরা বিভাগে ভর্তি করে দেয়া হোক। আমি শুনে অবাক, বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার এ নামে কোন বিভাগ আছে কি? ছাত্র নেতাদের কাছে জানলাম আলমিরাতে যেমন সব পরিধেয় সামগ্রী রাখা সম্ভব, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি সায়েন্স বিভাগে জ্ঞানের সব শাখার শিক্ষার্থী ভর্তি হতে

পারে। এভাবে আমি আলামরা বিভাগের অর্থ বুঝলাম। শুনেছি তোফায়েল আহমদ নাকি লাইব্রেরি সায়েন্সের ছাত্র হিসাবে তদানীন্তন ইকবাল হল থেকে ডাকসুর প্রতিনিধি হয়ে তারপর ডাকসুর ভিপি হয়েছিলেন।

আমি অবশ্য ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে অছাত্রকে ছাত্র বানাবার প্রক্রিয়ায় একমত ছিলাম না। রাজী হয়েছিলাম এই কারণে যে সেই নির্বাচনটাও বহুদিনের গ্যাপে হয়েছিল। জনাব আক্তারুজ্জামান ও জিয়াউদ্দিন বাবলুদের নির্বাচনের পর দীর্ঘ ব্যবধানে ১৯৮৮ নির্বাচন হয়েছিল কিন্তু পরের বছরও এই অছাত্রকে ছাত্র বানাবার প্রক্রিয়া বিদ্যমান থাকায় ও আরও কতিপয় কারণে আমি প্রক্টর হিসেবে পদত্যাগ করেছিলাম। অবশ্য চাপে পড়ে ও পরিস্থিতি সামাল দিতে আমাকে তারপরও সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্টের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। সে বছরে আমি হল সংসদের নির্বাচন পরিচালনা করি। এরপর এবারই নির্বাচন হতে যাচ্ছে।

এবারে আমি ছাত্রদের কতিপয় দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল, কেননা পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার কারণে একদিন যেমন পরিবহন সম্পাদকের পদ সৃষ্টি আবশ্যক ছিল। এখন প্রয়োজনে অন্য কোন পদ সৃষ্টি অভাবনীয় বা অবাঞ্ছিত হবে না। ডাকসুর কাঠামোতে পর্যাপ্ত হারে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা, ডাকসুতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও তথ্য প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক সৃষ্টির ছাত্রলীগের দাবি যুগোপযোগী ও সঙ্গত। কার্যকর পরিষদের

সদস্য সংখ্যাও বাড়ানো যায়। এক সময় হল সংখ্যা এখনকার চেয়ে অর্ধেকের কম ছিল, শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল প্রায় এক-চতুর্থাংশ, এমফিল ও পিএইচডির ছাত্র সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। বর্তমানে নিয়মিত ছাত্রদের সঙ্গে সান্ধ্যকালীন প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী প্রয়োজনে- অপ্রয়োজনে ব্যাপক হারে বেড়েছে। ভর্তির সময়ে এসব শিক্ষার্থীদের হলে আবাসন দেয়া হবে না বলে উল্লেখ থাকে। আমি জানি না তাদের কাছ থেকে এই মর্মে কোন অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে কিনা কিংবা কোন আইন আছে কিনা যাতে তারা ভোটার হতে পারবেন না। এমনটি হলে তাদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায়। কিন্তু অনুরূপ কোন অঙ্গীকার বা বিধি বা বিধান না থাকলে তারা ডাকসু নির্বাচন পিছিয়ে দিতে পারে। ছাত্রদের একাংশ ভিসির (সভাপতি) ক্ষমতা খর্ব করার প্রস্তাব করেছেন। তারা যুক্তি দিয়েছেন কি? আমার তো মনে হয় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য ভিসির ক্ষমতাটা অটুট রাখাই বাঞ্ছনীয়।

[লেখক : বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের সাবেক প্রক্টর ও সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্ট]